জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০

আহমদ ছফার 'বাঙালি মুসলমান'-প্রতীতি ও প্রমিত-বাংলা বিনির্মাণে তার ভূমিকা

মাহবুবুল হক*

Abstract

Ahmod Sofa (1943-2001), a renowned literary personality, thinker and public intellectual of Bangladesh, has his own notion of `Bangali Musolman' discourse which derived from history-old islamization in Bengal but crystallized during colonial era. Sofa incorporated the vernacular and literary exertion of `Bangali Musolman' with their incitement of social and political will. Thus the initiative and reformation of the standardization of Bangla language in early nineteenth century, is argued in different aspects, regarding sociocultural accreditation and acceptance of both Hindu and Muslim community. Ahmod sofa, probed into this historical controversy and ascertained the roll of both community. This view of Ahmod Sofa, still a contemporary discourse, is explored into this article.

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) রচিত প্রবন্ধসমূহ থেকে তাঁর চিন্তার যে পরিধি নির্ণয় করা যায় তার কেন্দ্রে বাঙালি মুসলমান, মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দীপ্র উপস্থিতি। বাঙালি জাতিসত্তার হাজার বছরের পথ পরিক্রমায়, ইতিহাসের বহুবঙ্কিম ঘটনাপ্রবাহ ও সূত্র-গ্রন্থি থেকে তথ্য নিয়ে আহমদ ছফা বাঙালির আত্মপরিচয় অন্বেষণ করেছেন মূলত বাঙালি মুসলমানের পরিচয় উদ্ঘাটনের স্বার্থে। সকল পশ্চাৎপদতা, গোঁড়ামি ও অধঃপতনের ঐতিহ্য মেনে নিয়েও বাঙালি মুসলমান-ই তার অভিনিবেশের বিষয়। কারণ ছফা মনে করেন, বাঙালি মুসলমান সমাজ তো পৃথিবীর সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে, 'ওউন' না করলে প্রকৃতপক্ষে নিজকে ভিন্ন একটি কালচারে 'গ্রাফট' করা হয়।[১] 'বাঙালি' জাতিসত্তার একাংশ কালক্রমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ঘনঘটায় বিবর্তিত হয়ে 'বাঙালি মুসলমান' অভীধায় চিহ্নিত হওয়া ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভারতবর্ষে ইসলামিকরণের বিশেষ ধারা, ছয় শতাব্দীব্যাপী মুসলিম শাসন এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সামাজিক সহাবস্থান নতুন নতুন সাংস্কৃতিক বলয়িত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ছিল। 'বাঙালি মুসলমান' ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয়ে তেমনই একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বলে আহমদ ছফা বিশ্বাস করেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সূচনা এবং ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে পরিচয়ের পূর্ণতা তাতে বাঙালি মুসলমানের ভূমিকাকে ঐতিহাসিক পারম্পর্যে ব্যাখ্যা করেন ছফা। বাঙালির পরিচয় যেমন বাংলা ভাষায় তেমনি বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ও বাংলা ভাষার গায়ে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক পরিচয় এঁকে দেয়ার মধ্যে। অন্তঃত ভাষার রূপকল্পে তা-ই মনে হয়, কিন্তু ভাষার গায়ে জাতির সাংস্কৃতিক উচ্চাভিলাষ খোদিত করার কার্যকারণ আরও অন্তঃগভীরে প্রোথিত। আহমদ ছফার প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার অনুসরণ করে এই কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

১.

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে মুসলমান পরিচয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কারণ ছফার ব্যাখ্যায় যতটা ধর্মীয় তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণিভেদের মধ্যে নিহিত। সুতরাং আহমদ ছফা কর্তৃক বর্ণিত 'বাঙালি মুসলমান' কারা সেই সংজ্ঞার্থ স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক–

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

> যারা বাঙালি এবং একই সঙ্গে মুসলমান তাঁরাই বাঙালি মুসলমান। এঁদের ছাড়াও সুদূর অতীত থেকেই এই বাংলাদেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন– যাঁরা ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যানুসারে ঠিক বাঙালি ছিলেন না।[২]

অস্পষ্ট নয় যে, বাংলাদেশের মুসলমান অথবা সকল বাঙালি মুসলমানই ছফা-বিধৃত 'বাঙালি মুসলমান' নয়। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক, যারা ছিল রাজশক্তির সহযোগী, সামাজিক-রাজনৈতিক সুবিধাভোগী এবং উঁচুকোটির প্রভুত্বশীল মুসলমান তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবেচনায় রাখেননি ছফা। কারণ এই শ্রেণি সবসময়ই দেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সাথে দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। এমনকি যারা নির্যাতিত বাঙালি মুসলমান সমাজের হয়েও 'নানা ফাঁকফোকর গলে' অর্থে-বিত্তে-প্রভাবে ক্ষমতাশালী হতো এবং সে-সুবাদে নিজ শ্রেণির সাথে সম্পর্ক 'চুকিয়ে দিত' ছফার বিবেচনায় তারাও 'বাঙালি মুসলমান' সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমান বলতে ছফা ধর্মীয় পরিচয়কে যতটা প্রাধান্য দিয়েছেন ততটাই গুরুত্ব দিয়েছেন সামাজিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত শোষক-শোষিতের সম্পর্কের ওপর। তাই আরও সুনির্দিষ্ট করে জানিয়েছেন যে, বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশই আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মানুষ, আর্য বা ব্রাহ্মণ্য শক্তির কাছে পরাজিত জনগোষ্ঠী, যারা এই ভূমির 'সাক্ষাৎ সন্তান' এবং 'ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি মানবগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হলো, এঁদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার। যদিও তাঁরা ছিলেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তথাপি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রশ্নে তাঁদের কোনো মতামত বা বক্তব্য ছিল না। একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙলা মৃত্তিকার সাক্ষাৎ সন্তানদের এই সামাজিক অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছিল।'[৩] এই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছফা সংক্ষেপে জানিয়েছেন, বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী মূলত নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত; তারচেয়ে বড় সত্য হল, এরা সমাজের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী।[৪] মৃত্তিকালগ্ন সমাজ গঠন করেও এই ব্রাত্য-শোষিত মানুষগুলো কখনও ভূমির ওপর ন্যায্য অধিকারটুকুও পায়নি। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে তারা বারবার ধর্ম পরিবর্তন করেছে; এবং এই পরিবর্তনের মধ্যেই যাবতীয় প্রতিবাদ ও ক্ষোভ মুদ্রিত রেখেছে। তাই এ কথা অনস্বীকার্য, 'নতুন ধর্ম গ্রহণ ছিল একটি নির্যাতিত মানবগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যবহারিক পদক্ষেপ',[৫] যা আজ পর্যন্ত বাঙালির আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদের সবচেয়ে বড় ব্যবহারিক দিক। ছফা মনে করেন যে, বাঙালির জাতিগত ইতিহাসের মধ্যেই অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাস বিধৃত। তাই সুদূর অতীতের ব্রাহ্মণ্যশাসন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা পর্যন্ত ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে সেই নির্যাতিত-প্রতিবাদী মানুষই বাঙালি মুসলমান পরিচয়ে স্থিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের সংগ্রামের এই দীর্ঘ ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করতে ছফা প্রায়ই 'নির্যাতিত' ও 'প্রতিবাদী' শব্দ দুটিকে ব্যবহার করেছেন। বাঙালি মুসলমানের জাতিগত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এই শব্দদ্বয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

২.

একটি জনগোষ্ঠীর ভাষাই সেই জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানসসম্পদ। বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক নির্জ্ঞানে যে ঐতিহাসিক ভীতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা শত শত বৎসর ধরে পুঞ্জিভূত হয়েছিল তার সচেতন উৎসারণ ভাষার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ভাষার মধ্য দিয়েই একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচরিত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দৈনন্দিন আবেগঅনুভূতি, প্রাত্যহিক সংরাগ-সংক্ষোভ, সর্বোপরি তার সকল সৃজনশক্তি ও লৌকিক-অলৌকিক জীবনদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই ভূখণ্ডের নির্যাতিত কৌম-জনগোষ্ঠীর প্রাকৃত ভাষার ওপর আর্যরা তাদের ভাষিক আগ্রাসন চালিয়েছে শতশত বৎসর ধরে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যাঁতাকলে পড়ে ম্লেচ্ছদের ভাষা কোন তন্ত্র-মন্ত্রে প্রবেশাধিকার পায়নি– না রাজতন্ত্রে, না পুরোহিততন্ত্রে। আবার সেই একই নির্যাতিত জনগোষ্ঠী রাজশক্তির পরিবর্তনে কখনও আরবি-ফারসি

আবার কখনও ইংরেজি ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছে বা জানাতে বাধ্য হয়েছে। সমষ্টির এই সকল সচেতন প্রয়াস ভাষার গায়ে এঁকে দিয়েছে অর্থবহ চিহ্ন– কখনও রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়, কখনও সৃজনের স্বতঃস্ফূর্ততায়, কখনও ধর্মীয় বিশ্বাসের নির্দেশনায়, কখনও নেহাত জাগতিক প্রয়োজনের তাগিদে। ছফার মতে, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাঙালি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষার চিহ্নও রয়েছে ভাষার গায়ে। ভাষা একটি সামাজিক শক্তি। ভাষার গায়ে রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের চিহ্ন পড়ে, সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তরও অঙ্কিত হয়। এসকল পরিবর্তন বা বিবর্তনের সাথে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও জড়িয়ে থাকে, সে কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে ভাষার বহুমুখী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না, ভাষাকে 'একটা জাতির রক্তবাহী ধমনী বলে অভিহিত করা যেতে পারে।'[৬] তাই ছফা 'বাঙালি মুসলমান'-এর শিকড় সন্ধান করেছেন ভাষার ধমনী বেয়ে। বাঙালি মুসলমান এই শক্তি প্রথম উপলব্ধি করেছিল পুথি রচনার মাধ্যমে। তার আত্মপরিচয় অন্বেষণের সূচনা তাই পুথিসাহিত্য। 'বাঙালি মুসলমানের মন' প্রবন্ধে ছফা এই প্রবর্তনার ভিত্তি সম্পর্কে জানিয়েছেন–

> বাঙালি সমাজের যে শ্রেণীটি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম গ্রহণ করার দরুন, তাদের মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটেছিল, সেই শ্রেণীটিতেই ছিল পুঁথিসাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তাঁরাই এর লেখক, পাঠক এবং সমঝদার।[৭]

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ছাড়াও পুথি রচনার পেছনে নতুন সামাজিক আকাঙ্ক্ষার প্রযোজনা ছিল। একদিকে 'বাইবেলের অরিজিন্যাল সিন' বা আদি পাপের ধারণার মতো অপমানজনক দূরস্মৃতিকে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান অপরদিকে নিজস্ব বীর ও নায়ক নির্মাণের তাগিদ, একদিকে শ্রেণি অবস্থানের অসহায়ত্ব অপরদিকে উন্নত আদর্শ ও সভ্যতার প্রতি অপরিচ্ছন্ন, অন্ধ, অকেলাসিত আবেগ– সবকিছুর সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল পুথিসাহিত্য। পুথিসংলগ্ন কাল ও লেখকদের মনস্তত্ত্বকে ছফা ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে–

> যে সময় ওগুলো রচিত হয়েছিল, সে সময়কার মুখ্য-গৌণ বিবদমান, বর্ধিষ্ণু যে সকল সামাজিক ধারা, ধারাসমূহের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কোথাও সুস্পষ্টভাবে পুঁথিসাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তুর্কি আক্রমণের ফলে আরেকটি নতুন সমাজ জন্মলাভ করেছে এবং সমাজের জনগণের একাংশের মধ্যে নতুন চলমানতার সঞ্চার হয়েছে, সেই নতুনভাবে চলমানতা অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বিকাশ করার উদ্দেশ্যেই পুঁথিলেখকেরা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন।[৮]

বাঙালি মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে নিজ নিজ সমাজের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এসব কাহিনি রচনা করেছে। এই সাহিত্যিক রূপায়ণের মধ্যে বিস্তর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা[৯], অকেলাসিত আবেগ ও উদ্ভট রসের ছড়াছড়ি থাকলেও তা একেবারে অভিনব নয়– বৌদ্ধ জাতক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মঙ্গলকাব্যসমূহেও এমন উদাহরণ বিস্তর। এসব পুথি শিল্পমানে যতই পশ্চাৎপদ এবং অপরিস্রুত হোক না কেন একথা মানতেই হয়, পুথি লেখকরা যে সমাজের অধিবাসী সেই সমাজেরই চাহিদার জবাব এসব পুথি। তাই এর সীমাবদ্ধতাও সেই সমাজেরই সীমাবদ্ধতা। ভাষাগত শ্রেণিবিভক্তি[১০] ছাড়াও সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনার মান, বিমূর্ত ভাব ধারণের মতো মানসিক সাবালকত্ব এবং বিদ্যমান অগ্রসর শিল্পাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এই তিন মৌল উপাদানের কোনটিই পুথি লেখকদের ছিল না।[১১] এ কারণে ছফার এই অনুসিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে– 'মুসলমান রচিত পুঁথিসাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীলতা আসলে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতারই সাহিত্যিক রূপায়ণ।'[১২] এই প্রতিক্রিয়া একটি নতুন সমাজে জনমনে সৃষ্ট নতুন আকাঙ্ক্ষার অভিক্ষেপ। তবে মীর মশাররফ হোসেনের কালে এসেও বাঙালি মুসলমানের চিন্তার এই বিশেষ স্থবিরতাকে শুধু প্রতিক্রিয়ার জের বলে মানতে চাননি ছফা। 'বাঙালি মুসলমানের মনের ওপর সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুণ বিস্তারিত গাঢ় মায়াজাল'-কে 'জাতির রূপকথা'র[১৩] সাথে তুলনা করে লেখা যায়, বাঙালি মুসলমানের সামষ্টিক নির্জ্ঞান স্তরে এই

রূপকথা এক ধরনের ইচ্ছাপূর্ব বা ইচ্ছাতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা আরোপ করে রেখেছে। তাই ছফার ভাষায় 'মানসিক ভীতি'তে নিমজ্জিত বাঙালি মুসলমান এই বাধ্যতার বাইরে পা রাখতে সাহস করে না।[১৪]

২.১

বাঙালি মুসলমানের অবগুণ্ঠিত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার হৃদ্‌স্পন্দন প্রথম অনুভব করেছিল পুথি লেখকরাই। ভাষার গায়ে এই নবগঠিত সামাজিক আকাঙ্ক্ষার চিহ্নই বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বিপুল মিশ্রণ। এই চাহিদায় সাড়া দিতে গিয়ে মুসলমান সাহিত্যিকদের যে মানসিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল ছফা তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন–

> আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবি হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবি-ফার্সি শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাঁদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি অজানা, ফার্সির নাম শুনেছেন এবং উর্দূভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।[১৫]

পুথি রচয়িতাদের এই লড়াই রাজনৈতিক আলোড়ন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে একই সাথে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতকে বিপুলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রয়াস হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে, কোন পরিণতির পথে ধাবিত হয়নি। এর কারণ, ছফার মতে, ভাষার মর্মবেগের সাথে সামাজিক চাহিদা ও বিকাশের দূরত্ব। কোন জ্ঞান বা বিদ্যা অনিবার্য সামাজিক চাহিদার পর্যায়ে না এলে সমাজে তার চল হয় না।[১৬]

কিন্তু মধ্যযুগে আরবি-ফারসির ছিল জাগতিক-আধ্যাত্মিক দুই দিকের উপযোগিতা, দুই শ্রেণির মানুষের কাছে। একটি সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণি তা হিন্দু বা মুসলিম যা-ই হোক যারা ক্ষমতাকেন্দ্র অটুট রাখার স্বার্থে আরবি-ফারসির চর্চা করত, অপরটি কৃষক-তাঁতি-জেলের মতো প্রান্তিক পেশাজীবী সাধারণ মুসলমান অর্থাৎ তথাকথিত নিম্নশ্রেণি যারা মূলত বাংলাভাষী; কেবল ধর্মীয় ভাষা হিসেবে সীমিত ক্ষেত্রে আরবি বা ফারসির সাথে পরিচিত ছিল। তাই একটি পশ্চাৎপদ, নির্যাতিত শ্রেণির মাধ্যমে ভাষা সামাজিকভাবে প্রচলিত হলেও যে শিক্ষিত শ্রেণির সক্রিয়তায় ভাষার গায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিকাশচিত্র অঙ্কিত হয় তাদের আনুকূল্য এই আরবি-ফারসি-মিশ্রিত বাংলা সেই সময় পায়নি। মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমানের এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশটির কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক সক্ষমতা ছিল না।[১৭] অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ দেয়ার উদ্যোগকালে অগ্রসর হিন্দু সমাজের মানসিকতায় প্রতিফলিত হয়েছিল সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার চিত্র। অগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজ তখনও ইংরেজি শিক্ষা তো বটেই, এমনকি বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদ। রেভারেন্ড জেমস লঙ-কে উদ্ধৃত করে অমলেন্দু দে-র বর্ণনা থেকে জানা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পরিস্থিতি–

> খুব সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা আরবি ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করেন। এই দুটো ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাঁদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাঁদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল। তাঁরা একথাও মনে রাখেন, মুসলমানেরাই তো ফারসিকে দেশ শাসনের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা করেন। তাই বাংলাদেশে যখন বাংলা ভাষা বাঙালির জাতীয় ভাষারূপে বিকশিত হয় এবং ফারসিকে স্থানচ্যুত করতে থাকে, তখন শিক্ষিত মুসলমানেরা তা সহজে মেনে নিতে পারেননি। যেহেতু সকল জাতিই মায়ের ভাষা অনুসরণ করে, সেজন্য তাঁদের পক্ষে বাংলা ভাষার অগ্রগতি রোধ করা অসম্ভব ছিল। তাই এই সময়ে শিক্ষিত মুসলমানেরা আরবি-ফারসি শব্দ মিশিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বাংলা ভাষা গঠনে উদ্যোগী হন। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি

> নির্ভর এই ভাষা ও সাহিত্য তাঁদের পথৃক সত্তা বজায় রাখতে সহায়ক হবে, এই ছিল তাঁদের আশা। একেই 'মুসলমানী বাংলা' বলা হয়।[১৮]

অন্যদিকে নিম্নশ্রেণির সাধারণ মুসলমানের জন্য 'মুসলমানী বাংলা'য় রচিত সাহিত্য এই শ্রেণিকে দ্রুত সাম্প্রদায়িকভাবে সচেতন করে তুলছে এটিও জেমস লঙ লক্ষ করেন; সুকুমার সেনও একই কথাই লিখেছেন–

> 'ইসলামি' বাঙ্গালায় লেখা বইগুলি অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, শিক্ষিত মুসলমান পাঠকের জন্যও নয়। বিমিশ্র শ্রমিক ও কৃষকের অবসরবিনোদনের জন্য রচিত হইত। তবুও কোন কোন রচনা তুচ্ছ করিবার নয়।[১৯]

কিন্তু সুকুমার সেন যাকে 'ইসলামি বাঙ্গালা' বলেছেন তার রূপটি কেমন তা জানা প্রয়োজন–

> সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অনেকে হিন্দুস্থানীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করিতেন। এই কারণে মুসলমান লেখকদের রচনার ভাষা সাধারণ সাধুভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভাষাকে ইসলামি বাঙ্গালা বলিতে পারি না। ইংরেজ আমলে শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবি-ফারসির সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ ভাষাই যথার্থ 'এছলামি বাঙ্গালা'।[২০]

সুকুমার সেনের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কথিত সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের 'মুসলমানি বাংলা' এবং নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের 'এছলামি বাঙ্গালা' ভাষায় আরবি-ফারসি বা হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণ লক্ষণীয়ভাবে পৃথক ছিল। 'এছলামি বাঙ্গালা' রূপটি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বা সমাজের নেতৃশ্রেণির মুসলমানদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিল না, আদরণীয় ছিল পুথি-সাহিত্যের সমঝদার নিম্নবিত্ত সাধারণ মুসলমান তথা সমাজের প্রান্তিক পেশাজীবী শ্রেণির নিকট। যদি পুথি সাহিত্যের রচয়িতাগণ বেহশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের আধ্যাত্মিক সুখ উদযাপনের জন্য বাংলা ভাষার গায়ে খুব ঘন করে আরবি-ফারসি-উর্দু খোদাই করে থাকেন, তাহলে এর শ্রোতাদের লক্ষ্যও যে কাব্যরস আহরণ ছিল না সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ইংরেজ আমলের গোড়ায়, এই সমাজের সদস্যদের আরবি বা ফারসির মতো বিদেশি ভাষা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে সেটিকে আধুনিক চৈতন্যস্রোতে প্রবাহিত করার জন্য 'না ছিল শক্ত আর্থিক ভিত্তি না ছিল সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ'[২১]। রাজানুকূল্যের তো কোন কারণই নেই। একটি ভাষার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে তা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না একথা যেমন সত্য তেমনি একথাও অনস্বীকার্য যে–

> ভাষা হল সামাজিক মানুষের জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রূপ। সেই সমাজের সমষ্টিগত জীবন যখন সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবে, ভাষা আপনা আপনিই সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হবে। সমাজিক জীবনে উন্নতির চেষ্টা না করে শুধুমাত্র ভাষাকে মাজা-ঘষা করে উন্নত করার প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত খাবার এবং ব্যায়ামের বদলে রুজ-পাউডার ইত্যাদি মেখে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধির অপচেষ্টার মত অর্থহীন।[২২]

আমরা জানি, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও কলকাতা ও হুগলি মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা চালুর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল মূলত পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্রদের বিরোধিতায়, যেখানে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাভাবনা সাধারণ মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতির ও বিকাশের পথে পাহাড়সমান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু স্বঘোষিত নেতৃত্বে থাকা উর্দু-ফারসিভাষী অবাঙালি মুসলমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুযোগসন্ধানী বিত্তবান বাঙালি মুসলমাদের গোষ্ঠীস্বার্থে আঘাত হানতে পারেনি। আহমদ শরীফ রচিত 'আঠারো উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে দু-একটি ধারণার পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধে এই দুই শ্রেণির মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানানো হয়েছে–

> স্বজাতির রাজত্ব হারানোর ক্ষোভজাত কিংবা ওয়াহাবী ফরায়েজী আন্দোলন প্রসূত ইংরেজ বি-ষ তেমন কেজো ছিল না প্রতীচ্য বিদ্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে। এসব আলোচনাকালে আমরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ বিহার-ওড়িশার মুসলিমদের অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করি না। আর এ-ও মনে রাখি না যে, বাঙলাদেশে মুসলিমরা সামাজিক-আর্থিক-নৈতিক-শৈক্ষিক প্রভৃতি সর্ব ব্যাপারে দুই পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তায় বাস করত। একদল ছিল বিদেশি উর্দুভাষী ধনী-মানী ফরাসি-আরবি শিক্ষিত অভিজাত মুসলিম, গাঁয়ে এসব পরিবার ছিল দুর্লভ, তুর্কি-মুঘল আমলের প্রশাসনকেন্দ্রে ও বন্দর এলাকায় ছিল (এবং এখনো আছে) এদের নিবাস। এরা সংখ্যায় নগণ্য বটে, কিন্তু ধন-মান-বিদ্যাবলে বাঙালির স্বঘোষিত ও ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃত নেতারা ছিলেন এদেরই গোষ্ঠীভুক্ত। কৃত্রিম কাঞ্চন কৌলিন্যে দেশজ কিছু মুনশী-মোল্লা-মৌলবীমুয়াজ্জিন-খোন্দকার-উকিল-হাকিম পরিবার অভিজাতরূপে স্বীকৃত ছিল, তবে উর্দুভাষীর কাছে হীনমন্যতায় ভুগত ও পাত্তা পেত না বলে এরা কখনো নেতৃত্ব দাবি করেন নি। এর অভিজাতবর্গের মধ্যে শিক্ষা ঐতিহ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে এরাই গোড়া থেকে ইংরেজি পড়া শুরু করে।[২৩]

শেষোক্ত শ্রেণিতে মীর মশাররফ হোসেন(১৮৪৭-১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯–১৯৩৩), মোজাম্মেল হক (১৯৬০-১৯৩৩), আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) প্রমুখ নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত। মুসলমান সমাজের অন্যদিকও ছিল–

> গোটা বাঙলাদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে সে-সব আতরাফ-আজলাফ নামে অবজ্ঞাত নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের এবং নিঃস্ব মুসলিম ছিল, তারাই ছিল সমাজে শতকরা নব্বই জন। যদিও সব গাঁয়েই দু-একজন স্বাক্ষর লোক মিলত, তবু সাধারণভাবে বলা যায় তাদের মধ্যে লেখাপড়ার কোনো ঐতিহ্য ছিল না। যেমন ছিল না তাদের জ্ঞাতি তাঁতি-হাড়ি-ডোমা-বাগদি-কেওট-চাঁড়াল- কামার-কুমোর-বারুই-তেলী প্রভৃতির মধ্যেও। শিক্ষার ঐতিহ্য থাকলে এরা ইংরেজি ও ইংরেজ-বি-ষবশে ইংরেজি বিদ্যা গ্রহণ না করলেও বাঙলা, ফারসি বা আরবি তো শিখত। কিন্তু এদের মধ্যে– এদের জীবনে কোনো প্রকার সাক্ষর শিক্ষার আভাসমাত্র মেলে নি। আজো যে পরিবার নিরক্ষর– তা স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিল নিরক্ষর।[২৪]

সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী, সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী বা নওয়াব আব্দুল লতিফের মতো বাঙালি-অবাঙালি মুসলিম নেতৃশ্রেণির কাছে শতকরা নব্বইভাগ প্রান্তিক মুসলমান কেবল তাঁদের অভিজাততন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখার উপকরণ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর উর্বর ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই ১৮১৭ সালে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ইংরেজি-বাংলা পাঠ্যবই রচনার কাজে সংস্কৃত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাধাকান্ত দেবের সাথে মৌলবি করম হোসেন, মৌলবি আব্দুল ওয়াহেদ এবং মৌলবি মহম্মদ আমিনুল্লাহ নামে তিনজন মুসলিম যুক্ত থাকা অথবা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানের ব্রিটিশ সরকারের নানা আনুকূল্য পাওয়া- এসবের মধ্যে কথিত সেই আজলাফ-আতরাফ মুসলমানের জীবনযাত্রায় কোন হেরফের হয়নি। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের বিখ্যাত পংক্তি 'যেসব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সেসব কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি'র শব্দে শব্দে বাংলা ভাষার প্রতি কবির প্রগাঢ় ভালবাসাই শুধু প্রকাশিত হয়নি, এ ভাষার অবজ্ঞাকারীদের প্রতি অন্তর্নিহিত ক্ষোভ ও মর্মবেদনার কথাও ধরা পড়েছে। যেমন অজানা আশংকার কথা পাই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি শেখ মুত্তালিবের কাব্য 'কিফয়িতুল মুসল্লীন' কাব্যের নিচের উদাহরণে–

> আরবিতে সকলে না বুঝে ভালমন্দ।
> তেকারণে দেশিভাষে রচিনু প্রবন্ধ ॥
> মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙালা করিলু।
> এই পাপ হইল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥

২.২

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে উল্লেখিত পরিস্থিতির নাটকীয় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ছফা-বর্ণিত সেই জনগণের মানসজগতে কোন বিপ্লবও সাধিত হয়নি, 'সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি

অজানা, ফার্সির নাম শুনেছেন এবং উর্দূভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।' এভাবে আরও অনেক তথ্যসংশ্লেষ থেকে বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, তথাকথিত অভিজাত ও অগ্রসর মুসলমান সমাজের চরম ঔদাসীন্যের দীর্ঘ পরিচয় দেয়া যায়। মোট কথা, বাংলা ভাষার একটি আধুনিক লেখ্যরূপ বিনির্মাণে 'এছলামী বাংলা'র প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদচিন্তার পরিবর্তে শ্রেণিগত অনগ্রসরতা ও সক্ষমতার অভাবই প্রধান বিবেচ্য বলে আমরা মনে করি। ফোর্ট উইলিয়ম বা শ্রীরামপুর মিশনারির উদ্যোগকে সামাজিক গদ্য নির্মাণের কোনো প্রয়াস হিসেবেই গণ্য করা যায় না। তথাপি গদ্যভাষা নির্বাচনের এই প্রয়াসের মধ্যেও বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী শিক্ষিত শ্রেণি অগোচর ছিল না। ছফা অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একথার যাথার্থ স্বীকার করেছেন। ইউরোপে রেনেসাঁর পর থেকে রিফরমেশন-এর সময় পর্যন্ত ধর্মের মানববাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরার উদাহরণ দিয়ে ছফা দেখিয়েছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের ধর্ম ও সমাজচিন্তার মধ্যেও ইসলাম ধর্মের এমন মানববাদী ব্যাখ্যার উদ্ভব প্রয়োজন ছিল। একটি গতিশীল আধুনিক সমাজসংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের অজ্ঞতা ও নেতৃত্বহীনতা, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা এবং চূড়ান্তভাবে 'ফিলিস্টিন' মানসিকতা[২৫] প্রতিপালনের মধ্যেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধানের সহায়তায় বাংলাভাষার লিখিত রূপের জন্য একটি কৃত্রিম ভাষারীতি নির্মাণ করেন। ইতোপূর্বে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের সাথে এ বিষয়ে আহমদ ছফার চিন্তাধারা মিলিয়ে দেখলে ইতিহাসের একই পাঠ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভাসিত হয়-

> আধুনিক ভাষার যে বিকশিত রূপ আমরা ব্যবহার করে থাকি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে এই ভাষার প্রাথমিক রূপরেখাটি তৈরি করেছিলেন। এই ভাষাটিই নানারূপ পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যদিও পরবর্তীকালে ভাগীরথী-তীরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার একটা সুন্দর সংশ্লেষ ঘটেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী-তীরবর্তী জনগণের ভাষার সংযোগ-সমন্বয়, মিলন-বিরোধের ইতিহাসই আধুনিক বাংলা ভাষার ইতিহাস। প্রতিভাধর এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য-সাধকদের চেষ্টা-প্রযত্ন এবং শ্রমের মধ্য দিয়ে এই ভাষাটি ভাব-চিন্তা, অনুভব-বিভব ধারণ করার উপযোগী হয়ে উঠেছিল, তাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। তথাপি স্বীকার করতেই হবে, তামাম বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে একটি মুখ্য এবং অগ্রগণ্য কারণ বর্তমান ছিল; আর সেটি হলো শহর কলকাতার ভাষাটিই মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার কল্যাণে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর চেপে বসতে পেরেছিল।[২৬]

উদ্ধৃতিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট একটি ভাষারূপ 'চেপে বসা'র তীর্যক ইঙ্গিত আছে তবে ছফার দ্বিমত নেই যে, বাঙালি মনীষীবৃন্দের সৃষ্টিশীলতার গুণে এই ভাষাই ভারতবর্ষের সবচেয়ে আধুনিক ও অপূর্ব প্রকাশক্ষমতা সম্পন্ন ভাষা হিসেবে বিশ্বমানবের স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়েছিল যে 'ইসলামি' বা 'এছলামী' কিংবা 'মুসলমানি' বাংলায় অথবা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'যাবনী মিশাল' ভাষায় সেটি ইতিহাসের পাদপ্রদীপে তথা সমাজের অন্তঃস্রোতে চলে যাওয়ায় এই অবলোপনের কথা ছফা লিখেছেন ভাষার বাঁক বদলের ঘটনাক্রমে। ভাষাকে নদীর সাথে তুলনা করলে মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে বাংলা ভাষার যে বাঁক সৃষ্টি হয়েছিল তারপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ সৃষ্টি করলেন আরেকটি বাঁক, যদিও তা সবটুকু সফল হয়নি। কিন্তু–

> যে ঝোঁক এবং প্রবণতা তাঁরা ভাষার শরীরের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। যদি পলাশীর বিপর্যয় না ঘটত, আজকের দিনে বাংলা ভাষার অন্যরকম একটি বিকশিত রূপ হয়তো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম। তবে 'যদি' আর 'কিন্তু' নিয়ে তো আর আলোচনা চলে না, যা ঘটেছে তা-ই সত্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকে বাংলা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে।[২৭]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর মতো মনীষীও পলাশীর যুদ্ধের পরিণতিকে 'যদি' 'কিন্তু'র সাপেক্ষতায় ফেলে 'পুঁথির ভাষাই বাংলা ভাষা হত' বলে 'মুসলমানি বাংলা'র অপার সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করায় সাম্প্রদায়িক আচরণকেই দায়ী করেছিলেন। তবে অশ্রুকুমার সিকদার মনে করেন–

> মুসলমানি পুথির ভাষা বাংলা বইয়ের ভাষা হত না, যাকে ভারতচন্দ্র 'যাবনী মিশাল' ভাষা বলেছেন, সেই ভাষা হয়তো হত। অর্থাৎ বর্তমানে বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দ শতকরা যত ভাগ থাকে, তার চেয়ে বেশি থাকত।[২৮]

যাঁদের এই পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, আমরা জানি, পলাশীর যুদ্ধের পর কতিপয় ঐতিহাসিক কারণে সেই মুসলমান অভিজাত শ্রেণি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁরা আপৎকালীন সময়ে কোন সামাজিক নেতৃত্ব দাঁড় করানোর দায়িত্ব নিতে পারেননি দুটি কারণে– প্রথমত সাধারণ মুসলমানের সাথে তাঁদের সামাজিক ও শ্রেণিগত দূরত্ব, দ্বিতীয়ত ভাষাগত ব্যবধান। পলাশীর যুদ্ধের পরিণতি যা-ই হোক অবাঙালি অভিজাত নেতৃশ্রেণির সাথে সাধারণ মুসলমানের দুস্তর ব্যবধান ও ভাষাগত শুচিবায়ু, যা আসলে সামাজিক শ্রেণিভেদের বহিঃপ্রকাশ, দূর করে অবাঙালি উর্দুভাষীদের বাংলা গদ্যের কাঠামো বিনির্মাণে নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোনো উপায় বা বাস্তবতা সেসময়ে উপস্থিত ছিল না এই সত্যটি অনুধাবন না করলে আধুনিক বাংলা লেখ্য ভাষার প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তি কাটানো দুরূহ।

নতুন সৃষ্ট শহর-কলকাতার ভাষাটির ব্যবহার ছিল সীমিত পরিসরে, বিস্তৃত জনজীবনে এই ভাষার তেমন কোন প্রভাব ছিল না। এর একটি কারণ শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা। বাংলাভাষা প্রেমিকদের অনেকে কট্টর ব্রিটিশপ্রেমিকও ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণ-কালে প্রখ্যাত সমাজসংস্কারকগণ ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-স্বদেশ সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে নতুন সৃষ্ট ভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন। সামাজিক চাহিদার সাথে নতুন ভাষার যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় দ্রুত এর বিকাশ ঘটতে থাকে। 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে ছফা লিখেছেন–

> যেহেতু বাংলাভাষার মাধ্যমে তাঁরা কতিপয় সামাজিক অনাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই ভাষাটিকে জনগণের বোধগম্য সরল এবং বক্তব্য প্রধান করে নিতে হয়েছিল, যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, বিচার করে দেখতে পারে এবং তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ জেগে ওঠে। সেদিন তাঁরা এক ঈশ্বরের আরাধনা, সহমরণ প্রথা নিবারণ, বিধবার বিয়ে দেয়া ইত্যাদি সংস্কারমূলক নানাবক্তব্য বাংলাভাষার মাধ্যমে টেনে এনেছিলেন। তার বাইরে যাবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। কেননা তা করলে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা তাঁদের করতে হত। ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ প্রকারে অসম্ভব। পরবর্তীকালে বাংলাভাষা এবং সংস্কৃতির যেটুকু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, তাও হয়েছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহন হওয়ার ফলে।[২৯]

যে ঐতিহাসিক কারণের কথা বলা হয়েছে সেটিও আমাদের অজানা নয়–ব্রিটিশ শাসনকাঠামোর সান্নিধ্যে থাকা সুবিধাভোগী শ্রেণিটির পক্ষে তখন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উন্মেষবিহীন একটি অসংহত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সাথে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না আবার শ্রেণির স্বার্থ ও সুবিধাজনক নিশ্চিন্ত অবস্থান ত্যাগ করার মতো সংকটও তাদের ছিল না। আরও একটি কারণ ছিল– বাংলাভাষী, বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী, আধুনিক শিক্ষার দুয়ার যাঁরা স্বেচ্ছায় বা আর্থ- সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কখনও মাড়ায়নি, তাঁরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল পুথিসাহিত্যে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ যে-ভাষাকে পারস্পরিক সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সেটি জনগোষ্ঠীর ভেতর ফল্গুস্রোতের মতো আরেকটি সমান্তরাল ভাষারীতি তৈরি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন সকলেই আরবি-ফারসি মিশ্রিত একটি স্বতন্ত্র বাংলাভাষারূপের কথা উল্লেখও করেছেন। তারপরও হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজ-সংস্কৃতির নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীলতা, সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা, সক্ষমতা-দুর্বলতা, উৎসাহ-

অনীহা, সামাজিক অগ্রসরতা-পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি বৈপরিত্ব-বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এবং 'যদি' 'কিন্তু' এড়িয়ে যে ইতিহাস লিখিত হল তা এমনই–

> ইংরেজ আমলের মুদ্রণের যুগের বাংলাভাষা গড়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়মের কলেজের পণ্ডিতদের হাতে। তাঁদের হাতে পড়ে বাংলায় ইতিপূর্বে নিত্য ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ যাবনিক শব্দ বাংলা থেকে নির্বাসিত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর এমনকি বিংশ শতাব্দীর বাংলা অভিধান সংকলনে এইসব শব্দ খুব কম স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন ঘটল। গড়ে উঠল যেন দুই রকমের বাংলা। উইলিয়ম কেরি ১৭৯৪ সালে সাটক্লিফকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, দুটো স্বতন্ত্র বাংলাভাষা সারা দেশে কথিত হয় 'The Bengali, spoken by the Brahmins and the higher Hindoos, and the Hindoostani spoken by the Musalmans and lower Hindoos; it is a mixture of Bengali and persian.' উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলাই হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যের ভাষা। তাছাড়া এই নতুন কালপর্বে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠল ইংরেজি শিক্ষিতদের হাতে। ইংরেজ তাদের হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এই কারণে, ধর্মের হানি হতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, দারিদ্র্যের কারণে, বাঙালি মুসলমান ইংরেজি-চর্চায় পিছিয়ে থেকেছে। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় যেহেতু গ্রহণ করল হিন্দুরা, আর ইংরেজি-জানাদের হাতেই যেহেতু গড়ে উঠল আধুনিককালের বাংলা সাহিত্য, সেই কারণে মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক এলাকার বর্ণহিন্দুরাই হলেন এই বাংলা সাহিত্যের নির্মাতা। বাংলাভাষার প্রতি মুসলমান সমাজের অনাগ্রহও এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। বাংলার প্রতি মুসলমান সমাজের এই অনাগ্রহের কারণ সবিস্তারে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর 'The Benglai Muslims 1871-1906' গ্রন্থে। সেই অনাগ্রহের প্রধান কারণ আশরাফ-আতরাফ বিভাজন। ১৮৭২ সালে জনগণনা অনুসারে মাত্র ১.৫২% ভাগ মুসলমান বহিরাগত আফগান বা মোগল অভিজাত বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় উর্দুভাষী মুসলমানই ছিল মুসলিম সমাজের নেতা। এই আশরাফদের বাংলাভাষা কেন, বাঙালি মুসলমান সম্বন্ধেও ছিল নিঃসংকোচ ঘৃণা। এই আভিজাত্যগর্বীদের একজন প্রশ্ন করেছেন, `How can we learn Bengali? Can Bangla-fangla be the language of the aristocratic Muslims?' তারা বাংলাভাষাকে মুসলমানের উপযোগী ভাষা মনে করত না, বাংলাভাষাকে মনে করত মূর্তিপূজক হিন্দুভাষা। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের মতো একজন বাঙালি গ্রন্থকারও মনে করতেন বাঙালি মুসলমানদের ভাষা বাংলা হওয়ায় বঙ্গীয় মুসলমানদের সর্বনাশ হয়েছে, তারা 'জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ' হয়ে গিয়েছে। বাংলাভাষী মুসলমানগণও একটু বিত্তশালী হয়ে উঠলে এই উর্দুভাষী আশরাফদের অনুকরণ করত।[৩০]

২.৩

এতসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষা-সংস্কারের উদ্যোগে বাঙালি মুসলমান সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ বা সরব প্রতিবাদ কতটুকু সম্ভব তা বিচার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকলে ক্রমশ কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষাটি গ্রহণ করতে শুরু করে। তবে এই গ্রহণের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ছফা –

> পাছে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পাঠকেরা উপহাস করতে পারেন, এই হীনম্মন্যতা থেকেই কি মুসলমান লেখকরা আপন সমাজে, পরিবারে, সংসারে সচরাচর ব্যবহৃত আরবি-ফার্সী শব্দসমূহ তাঁদের রচনায় যতটা সম্ভব পরিহার করতেন?[৩১]

এমন সন্দেহের পক্ষে ছফা কোনো প্রামাণ্য তথ্য-প্রমাণ হাজির না করলেও তাকে অমূলক বলা যায় না। কিন্তু ছফা এই গ্রহণবর্জনকে অযৌক্তিক মনে করেন না–

> মুসলমান লেখকরা অবশ্য কোলকাতাকেন্দ্রিক ভাষারীতি গ্রহণ করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। দুনিয়ার সব দেশেই ভাষার সর্বাধুনিক বিকশিত রূপটিকেই তাঁদের লেখার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন লেখকরা। মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক নেতা বলে স্বীকৃত লেখক-কবিরা তাই করেছিলেন।[৩২]

উপরন্তু, এই যুক্তিও অমূলক নয় যে, পুথি সাহিত্য বা আরবি-ফারসি-উর্দু-মিশ্রিত বাংলাভাষা যদি বাংলারই একটি বিশেষ ফলিত রূপ হয় তাহলে শহর-কলকাতা ও পণ্ডিতদের সংস্কৃতায়নের ফলে সৃষ্ট বাংলা রূপটিকেও আরেকটি ফলিত রূপ বলা যায়।[৩৩] বাঙালি মুসলমান শহর-কলকাতার ভাষারূপের সাথে অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণে দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর প্রতিভা বিচ্ছুরণের সূচনাকে বিলম্বিত করেছিল। হয়ত এ কারণেই বাংলা গদ্যের চেয়ে ছন্দোবদ্ধ পদ্যে বাঙালি মুসলমানের স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি। যেহেতু আধুনিক বাংলা চলিত রূপটি শহুরে শিক্ষিত মানুষের চর্চিত ভাষা তাই বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে তথা সারা বাংলায় এর প্রভাব ছিল খুবই সীমিত, যার ফলে লোকসাহিত্যের চর্চায় বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষাই সগৌরবে গৃহিত হচ্ছিল, এখনও হচ্ছে।

শ্রেণিগত কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোচিত সময়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করা অসম্ভব ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যশ্রেণির উদ্ভবে, ঐতিহাসিক বাংলা-ভাগের আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়ায়। তবে বিভাগোত্তরকালে অনুকূল পরিবেশে পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার সাথে লেখ্য ভাষার দূরত্ব কমিয়ে এনে সর্বসাধারণের উপযোগী ভিন্নরকম একটি প্রমিত ভাষা নির্মাণের ব্যর্থতার জন্য ছফা সরাসরি দায়ী করেছেন বাংলাদেশে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনুকরণপ্রিয়তা ও উদ্ভাবনীক্ষমতার অভাবকে। তারা 'বর্তমানের কর্তব্য তামাদির খাতায় রেখে ইসলামের নামে ভাষার মূল কাঠামোটি নষ্ট করা ছাড়া'[৩৪] আর কোন প্রয়াস গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকাশিত 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে' প্রবন্ধে ছফা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে প্রমিত বাংলার স্বকীয় রূপ থাকা বাঞ্ছনীয় এবং প্রচলিত রূপটি কলকাতাকেন্দ্রিক বলে তা বর্জনীয়।[৩৫] এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিবেচনাযোগ্য। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আজন্ম-লালিত আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে জনগণের দাবিতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাকে সর্বস্তরে ব্যবহারের সংকট ও সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় না রেখেই বাংলা চালু করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা দেখা দেয় এক শ্রেণির রাজনীতিক-আমলা-সুধিজনের মধ্যে। ছফা মনে করেন, বাংলাভাষার প্রতি মমতার আতিশয্যে ভাষার সর্বনাশই তারা ডেকে এনেছিলেন। ভাষার ব্যবহারোপযোগিতা এবং জনসাধারণের ভাষিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি উপেক্ষা করে 'লাঠি মেরে বাংলা চালানো'র ফল হল জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাভাষা বিকশিত হতে না পারা। আরেকটি বড় কারণ, ছফার মতে, শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা, তথা মান বাংলাভাষা এবং সর্বসাধারণের স্তরে মুখের ভাষার পার্থক্য। তাই ছফার এই মন্তব্য বিদ্রুপাত্মক হলেও উপেক্ষণীয় নয় যে, 'বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ বর্তমানে যে বাংলা ভাষাটি ব্যবহার করেন, তা তাঁদের মুখের ভাষা নয়। লেখাপড়া শিখে লায়েক হলে এই বাংলাভাষাটি তাঁদের মুখে আপনিই এসে যায়।'[৩৬] জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির সাথে ভাষার উন্নয়ন বা বিকাশ সম্পর্কিত। জাতির অভিজ্ঞতা, সমাজের সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক অভিরুচি ও সৃজনশীলতার সুষম বিকাশের সঙ্গে গড়ে ওঠে ভাষার শক্তি। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জাতির ভাষা কখনও সমৃদ্ধ হতে পারে না। এসবই ঔপনিবেশিক খণ্ডিত মানসিকতার ফল; ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে এর লালন-পালন। তাই বাংলাভাষার দীনতা ঘুচাতে হলে প্রমে এই ঔপনিবেশিক মানসিকতার অবসান ঘটিয়ে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে গণমুখী রূপ দিতে হবে বলে মনে করেন ছফা।[৩৭] এসব উদ্যোগ ও কর্মসূচি সবই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। কেবল একটি সমন্বিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিপ্লবই পারে এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

৩.

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বাংলাদেশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে ছফা দুটি দলে চিহ্নিত করেছেন– এক দলে আছেন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষ, অপর দলে

আছেন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দুদলের রুচি ও ধরন আলাদা। প্রথম দলের মুখের ভাষা আদিম যুগের মৌখিক বাংলা, যা এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র আঞ্চলিক বিভিন্নতা নিয়ে মানুষের মুখে মুখে চলছে। তবে কলকাতার কথ্যভাষাকে যারা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন তারা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং এই ভাষাকেও ইসলামের নামে বা আঞ্চলিক ভাষার নামে জবরদস্তি সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের মুখের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। ইসলামের নামে আরবি, ফারসি শব্দকে অহেতুক প্রাধান্য দিয়ে অথবা ঢাকা-চট্টগ্রাম-বরিশালের আঞ্চলিক ভাষার গালাগালকেও মুখের ভাষার নামে তুলে আনা বা প্রাণচাঞ্চল্যহীন স্থবির ভাষাকে ইট-পাথরের মতো ভাষার গায়ে বয়ে বেড়ানো– এ সবই, ছফার মতে, ঐতিহ্যের নামে ভাষার ওপর অত্যাচার।[৩৮] ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত ভাষা স্বমহিমায় আধুনিক রূপ নিয়ে জাতীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে এমন আশার কথা বর্ণিত হয়েছে ছফার লেখায়– 'জনগণের মুখের ভাষাকে আধুনিক রূপ দান করার অর্থে বোঝাতে চাই তাতে আধুনিক চৈতন্য স্রোত প্রবাহিত করানো।' এ ভাষা শহর কলকাতার কথ্য বাংলা নয়, আবার 'ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশালের পল্লীঅঞ্চলে ব্যবহৃত গালাগাল দেয়ার ভাষা'ও নয়।[৩৯]

বাংলাদেশে একটি সার্বভৌম ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙালি জাতিগঠনের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় ভাষা গঠনের প্রয়োজনীয়তার অনুভব করেছেন ছফা। কারণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে এবং পরবর্তীকালে নব্য-উপনিবেশী শোষণের জাঁতাকলে যে মানুষ খর্ব ও কৃশ হয়ে গেছে তাকে স্বাধীনসত্তার অহমিকায় দাঁড় করাতে প্রয়োজন শক্তিশালী ভাষার; যে ভাষা সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, ধারণ করতে পারে সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার বর্ণালি। ভাষা 'জাতির চিন্ময় সত্তাকে ধারণ করে, জাতীয় জাগরণের প্রথম স্পন্দনও ভাষার শরীরে অনুভূত হয়',[৪০] তাই ভাষাকেই প্রথম জাগাতে হয় সকল বৈষম্য আর পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে, হাতিয়ার হিসেবে। সমাজ ও সংস্কৃতির মতো ভাষাও বাংলাদেশের সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে অবদান রাখতে পারে বলে ছফা বিশ্বাস করতেন। তাই ভাষার সক্ষমতা অর্জনকে ছফা সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামো ঔপনিবেশিক আর্থকাঠামোরই সৃষ্টি এবং ভাষাদেহেও সেই ঔপনিবেশিক নির্ভরতা প্রবহমান। উপনিবেশিতের সংস্কৃতির ওপর উপনিবেশক যে আধিপত্য বিস্তার করে ভাষাই সে চিহ্ন বহন করে থাকে। তাই একযোগে ভাষার সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে ঔপনিবেশিকতা তথা দাসত্বের চিহ্নগুলো মুছে ফেলাই স্বাধীন জাতির প্রথম কর্তব্য। এটিও একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুবর্ণরেখা। যেখান থেকে পুরো সমাজ এবং অর্থনীতির খোল-নলচে বদলে দিয়ে এক নতুন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির উত্থান ঘটবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ ছফা, 'এ *দেশের মানুষের প্রাণশক্তি অসাধারণ*' (সাজ্জাদ শরীফকে দেয়া সাক্ষাৎকার), *আহমদ ছফা রচনাবলি (তৃতীয় খণ্ড)*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮), পৃ. ৩৮৪।

২. আহমদ ছফা, 'বাঙালি মুসলমানের মন', *আহমদ ছফা রচনাবলি (প্রম খণ্ড)*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮), পৃ. ১০২।

৩. তদেব, পৃ. ১০৩-১০৪।

৪. ছফা বাঙালিকে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করতে উৎসাহ বোধ করতেন, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারে তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ১৯৯৪ সালে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ছফা বলেছেন– 'বাঙালি মুসলমানেরা এ দেশের মাটির আসল সন্তান। তারা প্রভুত্বকামী আর্যদের সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত নয়, তেমনি আগ্রাসী তুর্কী তাতার, ইরানী তুরানীদেরও কেউ নয়। শুরু থেকেই বাঙালি মুসলমান একটা নির্যাতিত মানবগোষ্ঠী।' বিস্তারিত- আহমদ ছফা, 'এক সন্ধ্যার আলাপ'

(মীজানুর রহমান মীজান-কে দেয়া সাক্ষাৎকার), *আহমদ ছফা রচনাবলি (তৃতীয় খণ্ড)*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮), পৃ. ৩৫৮।

৫. আহমদ ছফা, 'বাঙালি মুসলমানের মন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

৬. আহমদ ছফা, 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে', *আহমদ ছফা রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮), পৃ. ১৮৮।

৭. আহমদ ছফা, 'বাঙালি মুসলমানের মন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

৮. তদেব, পৃ. ৯৩।

৯. মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু* আলোচনা প্রসঙ্গে পুথি লেখকদের এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে প্রথম উদ্ঘাটন করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, তিনি একে ইতিহাস তো দূরের কথা, অলৌকিকতার সীমাকেও অতিক্রম করে যাওয়ার মতো 'ডাহা আজগুবি, অতিরঞ্জিত' বিষয় মনে করেছেন। বিস্তারিত– মুনীর চৌধুরী, *মীর-মানস* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৫), পৃ. ৪৭।

১০. বাঙালি মুসলমানের পুথি রচনার প্রয়াসে ভাষার গায়ে খোদাই করা সাম্প্রদায়িক অন্ধ অনুরাগ ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে। পুথির ভাষা দো-ভাষী অর্থাৎ আরবি-ফারসি-মিশ্রিত বাংলা হওয়ার পেছনেও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শোষণ-নিপীড়নের ইতিহাস বিধৃত। বিস্তারিত– আহমদ ছফা, 'বাঙালি মুসলমানের মন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।
আবার, সুকুমার সেন এর মতে – অষ্টাদশ শতাব্দে স্বাধীন সুলতানী আমলের পূর্ব থেকেই বাঙালি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বাংলা শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে এবং মুসলমান লেখকদের মধ্যে আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সে সময়, ধর্মীয় বা দৈনন্দিন কাজে, বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসির শব্দের প্রবেশ অবারিত ছিল বলে জানিয়েছেন সুকুমার সেন। তাঁর ভাষায়– 'হিন্দুস্থানীভাষী ও বাঙ্গালাভাষী মুসলমানের সামাজিক ও গার্হস্থ্য মিলনে কোন রকম জাতিপাঁতির দুস্তর বাধা ছিল না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অনেকে হিন্দুস্থানীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করিতেন। এই কারণে মুসলমান লেখকদের রচনার ভাষা সাধারণ সাধুভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভাষাকে ইসলামি বাঙ্গালা বলিতে পারি না। ইংরেজ আমলের শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ ভাষাই যথার্থ "এছলামি বাঙ্গালা"।' তবে লক্ষণীয় পার্থক্য হল ' "ইসলামি" বাঙ্গালায় লেখা বইগুলি অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, শিক্ষিত মুসলমান পাঠকের জন্যও নয়। বিমিশ্র শ্রমিক ও কৃষকের অবসর বিনোদনের জন্য রচিত হইত। তবুও কোন কোন রচনা তুচ্ছ করিবার নয়। অনেক রচনায় প্রচুর পদ অথবা গান সন্নিবিষ্ট আছে। সে সব গানের মধ্যে ভালো রচনা নিতান্ত দুর্লভ নয়।' বিস্তারিত- *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রম খণ্ড অপরার্ধ (কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৫৪৯।

১১. আহমদ ছফা, 'বাঙালি মুসলমানের মন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬।

১২. তদেব, পৃ. ৯৭।

১৩. মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং দার্শনিক জ্যাক লাকাঁকে উদ্ধৃত করে সলিমুল্লাহ খান লিখেছেন, ব্যক্তি-মানুষের যেমন স্বপ্ন, তেমনি জাতির জীবনে তার রূপকথা। পুথির জগৎ ও বিষাদ-সিন্ধুর জগৎ যদি আমরা রূপকথা জ্ঞানে পড়ি তো মুনীর চৌধুরীর জিজ্ঞাসা জলের মধ্যে লবণের মতন মিশে যায়। স্বপ্নের যেমন নিজস্ব গঠনবিধি, রূপকথারও তেমন চলনরীতি। জাক লাকাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের তথাকথিত যুক্তিনিষ্ঠ ভাষাও স্বপ্ন আর রূপকথার গঠনরীতির ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নে, রূপকথায়, ভাষায় যে পুনরাবৃত্তি ঘটে তা ব্যক্তির বা জাতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ফল নয়– এক ধরনের ইচ্ছাপূর্ব বা ইচ্ছাতিরিক্ত বাধ্যবাধকতার ফসল। বিস্তারিত- সলিমুল্লাহ খান, *আহমদ ছফা সঞ্জীবনী (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী*, ২০১০), পৃ. ৪৩।

১৪. আহমদ ছফা, 'বাঙালি মুসলমানের মন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

১৫. তদেব, পৃ. ১০০।

১৬. আহমদ ছফা, 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯।

১৭. বাংলা গদ্যভাষা নির্বাচনকালের বিতর্ক সম্পর্কে দেবেশ রায়ের বিশ্লেষণেও একই মত উচ্চারিত হয়। বিস্তারিত - দেবেশ রায়, 'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', *আঠারো উনিশ শতকের বাংলা গদ্য ও উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য (অখণ্ড সংশোধিত সংস্করণ)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২০১।

১৮. অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ৯০-৯১।

১৯. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রম খণ্ড অপরার্ধ (কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৫৪৯।

২০. তদেব।

২১. আহমদ ছফা, 'বাঙালি মুসলমানের মন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।

২২. আহমদ ছফা, 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮।

২৩. আহমদ শরীফ, *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালিত্ব* (ঢাকা : অনন্যা, ২০০১), পৃ. ১৬৭।

২৪. তদেব।

২৫. উন্মুল, উদ্বাস্তু মানসিকতা অর্থে শব্দটি ছফা ব্যবহার করেছেন, বাঙালি মুসলমান এবং বাংলাদেশের '৪৭-পরবর্তী মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর মানসিকতা প্রসঙ্গে। বিস্তারিত- আহমদ ছফা, 'বাংলার চিত্রঐতিহ্য : সুলতানের সাধনা', *আহমদ ছফা রচনাবলি (প্রম খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩।

২৬. আহমদ ছফা, 'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ', উত্তরখণ্ড, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১১), পৃ. ১০১।

২৭. তদেব।

২৮. অশ্রুকুমার সিকদার,'বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় ও ভাষাদ্বন্দ্ব', *হালখাতা* (সম্পাদনা-শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত), বাঙালি মুসলমান সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ২২৮।

২৯. আহমদ ছফা, 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯।

৩০. অশ্রুকুমার সিকদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮-২৯)

৩১. আহমদ ছফা, 'নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৩২. তদেব।

৩৩. তদেব।

৩৪. আহমদ ছফা, 'বাংলাভাষা : রাজনীতির আলোকে', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪।

৩৫. প্রমিত বাংলা সম্পর্কে আহমদ ছফার এই মত মৌলিক নয়। আবুল মনসুর আহমদ বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার জন্য একটি ভিন্ন প্রমিত বাংলার প্রস্তাব করেন তাঁর *পাক-বাংলার কালচার* গ্রন্থে (পরবর্তীকালে *বাংলাদেশের কালচার* নামে পুনঃপ্রকাশিত)। প্রকৃতপক্ষে সেই বাংলা তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আঞ্চলিক ভাষা। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন-'পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় ঢাকায় পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার ভাষার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই ভাষাই পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা হইবে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়ালেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়ালেক্ট যেমন তাহাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইয়াছিল আমাদের বিক্রমপুরী ডায়ালেক্ট, তেমনি ঢাকাইয়া ভাষার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।' বিস্তারিত- আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের* কালচার (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং, ১৯৬২), পৃ. ১৩২।

৩৬. আহমদ ছফা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪।

৩৭. তদেব, পৃ. ২০২।

৩৮. তদেব, পৃ. ১৯৬।

৩৯. তদেব।

৪০. তদেব, পৃ. ১৯৫।